The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.61 - 68)
Published in October, 2025

রাজশেখর বসুর পুরাণ চেতনা

ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ*

প্রতিপাদ্যসার: বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম ভারতীয় পুরাণ ব্যবহারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু হাস্যরসের বিদগ্ধ এই শিল্পীর গল্পগ্রন্থগুলো হলো– গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তুরী মায়া, কৃষ্ণকলী, নীলতারা, আনন্দীবাঈ, চমৎকুমারী। এই নয়টি গল্পগ্রন্থে গল্পের সংখ্যা- ৯৭। তবে তাঁর রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা একুশ। তার মধ্যে বেশ কিছু গল্পে পুরাণের প্রসঙ্গ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জাবালি, পুনর্মিলন, প্রেম চক্র, তিন বিধাতা, ভরতের ঝুমঝুমি, স্মৃতিকণা, ডমরু পণ্ডিত অন্যতম। তাঁর অনুবাদগ্রন্থ হলো– 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি। অনুবাদগ্রন্থসমূহ ও কয়েকটি গল্প অবলম্বনে রাজশেখর বসুর ভারতীয় পুরাণ চেতনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

রাজশেখর বসু (ছদ্মনাম পরশুরাম নামে বেশি পরিচিত; জন্ম– ১৬ মার্চ ১৮৮০, মৃত্যু– ২৭ এপ্রিল ১৯৬০) একজন বাঙালি রসায়নবিদ, লেখক এবং অভিধানকার ছিলেন। তিনি প্রধানত তাঁর হাস্যরসাত্মক এবং ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পের জন্য পরিচিত এবং বিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান বাঙালি লেখক হিসেবে বিবেচিত। তিনি ১৯৫৬ সালে পদ্মভূষণে ভূষিত হন।

পরশুরাম ব্রিটিশ ভারতের (ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা) কান্দরসোনার কাছে বামুনপাড়ায় মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু এবং মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী। রাজশেখর বসুর একটি কন্যা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেক ট্র্যাজেডির শিকার হয়েছেন। তাঁর জামাই খুব অল্প বয়সে মারা যায় এবং একইদিনে তাঁর মেয়েও। ১৯৪২ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান এবং পরবর্তী আঠার বছর নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন (*সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, *১ম খণ্ড*, ৬৪৩)।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা আর ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অথচ গল্প লেখার আসরে তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তিনিই হয়ে উঠেছেন হাস্যরসিক। তিনি ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের অর্থ ও রাসায়নিকের আকারে গোপন সহায়তা প্রদান করেন এবং বোমা তৈরিতে তার দক্ষতাও প্রদান করেন।

বিশের দশক থেকে রাজশেখর বসুর লেখালেখির জীবন শুরু। একটি মাসিক পত্রিকার জন্য হাস্যরসাত্মক গল্প লেখার সময় তিনি "পরশুরাম" নামটি গ্রহণ করেন। পৌরাণিক চরিত্র পরশুরামের সাথে মিল বা শ্রদ্ধা রেখে এই নাম গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, বসু কেবল পরিচিত কারও উপাধি ধার করেছিলেন। তাঁর গল্পের প্রথম বই, 'গড্ডলিকা' ১৯২২ সালে প্রকাশিত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় চলন্তিকা। এটি একটি বাংলা অভিধান। বাংলা শব্দের অর্থ বাংলা ভাষাতেই এখানে দেওয়া হয়েছে। অভিধানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেন–

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

'অবশেষে, আমাদের কাছে বাংলার জন্য একটি অভিধান আছে। আপনি পরিশিষ্টে যে বাংলার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাও চমৎকার।' চলন্তিকা বাংলা অর্থশাস্ত্রের সংস্কার ও যুক্তিযুক্ত করার জন্য বসুর প্রথম প্রচেষ্টাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এটি প্রকাশের কয়েক বছর আগে, ১৯৩৫ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা শব্দের বানান নিয়ন্ত্রণের একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য তাঁর সভাপতিত্বে কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশগুলি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং চলন্তিকা আজও বাংলা ভাষাবিদ্‌দের কাছে সমাদৃত।

রাজশেখর বসু ছিলেন বিচিত্র কৃতিত্বের মানুষ। বাংলায় মুদ্রণের ইতিহাসেও বসুর বড় ভূমিকা ছিল। তিনি সুরেশচন্দ্র মজুমদারের প্রধান সহকারী ছিলেন, বাংলা লিপিতে প্রথম লিনোটাইপ তৈরির কৃতিত্ব। পরশুরামের হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্পের দ্বিতীয় সংস্করণটি ছিল সম্পূর্ণ বাংলা লিনোটাইপে মুদ্রিত প্রথম বই।

রাজশেখর বসু তাঁর লেখালেখির জন্য যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৯৪০ এবং ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে জগত্তারিণী ও সরোজিনী পদক প্রদান করে। ১৯৫৭ সালে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. পরের বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তা অনুসরণ করে। কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার জিতেছিল এবং ১৯৫৬ সালে তিনি পদ্মভূষণে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে, তিনি আনন্দীবাই ইত্যাদি গল্পের জন্য একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। ত্রৈলোক্যনাথের পর বাংলা হাস্যরসের ধারায় উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজশেখর বসু। পরশুরাম ছদ্মনামে তিনি বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। পৌরাণিক পরশুরাম কুঠার হাতে একদা ক্ষত্রিয় নিধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ যুগের পরশুরাম যুগের নানা অসঙ্গতি, অসত্য, কলুষতাকে দূরীভূত করতে কুঠার হাতে বাংলা ছোটগল্পের আসরে অবতীর্ণ হন।

২.

প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি রাজশেখরের পারিবারিক ও ঐতিহ্যগত টান তো ছিলই, আর রোমান্টিক সাহিত্যের প্রতিই টানেই তাঁকে কালিদাসের "মেঘদূত" কাব্যের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে, যে কাজেই তিনি মন দিতেন, তাতে হালকাভাবে করতে তাঁর মন উঠতোই না। তাঁর বৈজ্ঞানিক মন, সব খুঁটি-নাটি না জানা পর্যন্ত শান্তি পেত না। ল্যাবরেটরিতে একটা রাসায়নিক দ্রব্যকে পরীক্ষা করার জন্য যে সতর্কতা আর পর্যবেক্ষণ দরকার হয়, ঠিক সেই ধরনের সতর্কতা তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করতেন।

রামায়ণ অনুবাদের সময় পণ্ডিত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ তাঁকে সাহায্য করতেন, সেটা তিনি ভূমিকাতেই লিখেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সাহায্যকারী হিসেবে অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য কাব্য পুরাণ সাংখ্যতীর্থের নাম আছে। এছাড়াও রাজশেখর হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ এবং অন্যান্য লেখকদের অনুবাদও যত্ন সহকারে পড়েছিলেন। "যজ্ঞ" ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে রামেন্দ্রসুন্দরের "যজ্ঞ কথা" এবং অন্যান্য বইও মন দিয়ে পড়ে অনুসরণ করেছিলেন। ঠিক, এমনটি করেছিলেন মহাভারত রচনার সময়। দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের লেখা প্রায় সব বই পড়ে তার নির্যাস নিয়েছিলেন।

রাজশেখরের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর শিল্প সরস সহৃদয়তার ফলে বাংলা সাহিত্যের লাভ হয়েছিল প্রচুর। কারণ, তিনি এই দুটো মহাকাব্যের কোনগুলো বর্জনীয় আর কোনগুলো গ্রহণযোগ্য, সাধারণ পাঠকের কাছে বাল্মীকি-ব্যাসের রচনার সমগ্র, সতর্ক, জাগ্রত এবং নির্ভুলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নিজস্ব কথ্য ভাষারীতিতে মূল রামায়ণ মহাভারতের রচনাকালের ঘটনার পরিচয় দিতে গিয়ে যে সব তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন- তা শুধু মানান সই নয়, অত্যন্ত সুখশ্রাব্য এবং কাব্যগুণে ভরা। কিন্তু, এই দুটোর রচনা ছকে বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

রাজশেখর মহোদয় বাল্মীকি রামায়ণকে অবলম্বন করে সংক্ষিপ্তসার রামায়ণ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি মূল রামায়ণের কিছু শ্লোকও উদ্ধৃত করেছেন। রাজশেখর লিখেছেন–'বাল্মীকির রচনায় কাব্যরসের অভাব নেই। প্রাচীন সমাজচিত্র, নিসর্গ বর্ণনা এবং কৌতুকাবহ প্রসঙ্গও অনেক আছে যা কৃত্তিবাসাদির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে বাল্মীকির বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার রচনার সঙ্গে পাঠকের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পরিচয় হবে এই আকাঙ্ক্ষায়, স্থানে স্থানে নমুনা স্বরূপ মূলশ্লোক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ সহ দেওয়া হয়েছে। পাঠকের যদি রুচি না হয়, তবে পড়বার সময় উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অগ্রাহ্য করতে পারেন (রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি রামায়ণ* ২১)।' মহাভারতের কোনো মূলশ্লোক খুব জনপ্রিয় বা পরিচিত ছাড়া তিনি বইয়ের মধ্যে দেন নি। কিন্তু একটা বিস্তৃত পরিশিষ্টের মধ্যে– স্থান, ব্যক্তি পরিচয়াদি দিয়েছেন– যা মহাভারতে নেই। এখানেও রাজশেখরের বৈজ্ঞানিক এবং রসিক চিত্তের একটা সুন্দর সমাবেশ পাওয়া যায়।

রাজশেখর বসুর রামায়ণ এবং মহাভারতের একটা তুলনা করলে দেখা যায়– ক) মহাভারতের সংস্কৃত, রামায়ণের থেকে কঠিনতর এবং কিছু জায়গায় দুর্বোধ্য। খ) মহাভারতে ব্যক্তি এবং স্থানের সংখ্যা, রামায়ণের থেকে অনেক বেশি। গ) সাধারণ পাঠকের পক্ষে মনে রাখা বা বোঝা বেশ কঠিন–এজন্য রাজশেখর সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনেক যত্ন নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ পাঠককে রামায়ণ এবং মহাভারত বোঝাতে চেয়েছিলেন। মহাভারতের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন– 'এতে মূল গ্রন্থের সমস্ত আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে। কেবল, সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞ্জক নয়, সেই অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বিস্তারিত বংশতালিকা, যুদ্ধ বিবরণের বাহুল্য, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি ও পুনরুক্ত বিষয়। স্থান বিশেষে নিতান্ত নীরস বিষয় পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সারানুবাদের উদ্দেশ্য– মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে, সমগ্র মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য করা (রাজশেখর বসু, *মহাভারত* ১৯-৩১)।' এই উদ্দেশ্য যে পূরণ হয়েছে, সেটা যে পাঠক রাজশেখরের মহাভারত পড়েছেন বা পড়বেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য। বিজ্ঞান তপস্বীর বিস্তৃত জ্ঞানের যে গাণিতিক সংহতি ও শৃঙ্খলা– পরিমিত ও গূঢ়ার্থ ভাষণের যে নৈপুণ্য, তার মোটামুটি পরিচয় তাঁর পুরাণ ভাবনার মধ্যে ছড়ান থাকলেও, রামায়ণ-মহাভারতের দুটি ভূমিকার মধ্যে একুনে (৭ + ১৪= ২১) পাতার মধ্যে যেমন ভাবে লেখা হয়েছে সেটা তুলনাহীন।

৩.

রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামে যেন পুরাণকে নতুন ভাবনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পূরণের জন্যই সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন– 'জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুবই কম। কর্মক্ষেত্রে (বেঙ্গল কেমিক্যাল-র অফিসে) যাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা তা ওই রামায়ণ-মহাভারত পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে (কল্যাণী ঘোষ, *জীবন ও সাহিত্য* ৬)।' পরশুরামের এই স্বীকারোক্তির নিরিখে স্মরণ করা যায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের অনুষঙ্গে, পৌরাণিক আবহে লেখা গল্পগুলির কথা। এ ধরনের প্রথম লেখা গল্প 'জাবালি'। তাছাড়া 'হনুমানের স্বপ্ন', 'প্রেমচক্র', 'দশকরণের বাণপ্রস্থ', 'তৃতীয়দ্যূতসভা', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'বাল্যখিল্যগণের উৎপত্তি', 'কর্দম মেখলা' ইত্যাদি গল্পগুলি পৌরাণিক আবহে লেখা। কিন্তু শুধু আবহটাই পুরাণের কারণ পুরাণ থেকে দু'একটি প্রসঙ্গ বা চরিত্রের নামগুলিই গ্রহণ করেছেন পরশুরাম। কাহিনি ও বিন্যাস তাঁর নিজস্ব। নিজের মতো পুরাণের ব্যাখ্যা করেননি, নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন পুরাণের। তাঁর লেখা পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে বিশেষত্ব হল (দীপক গোস্বামী, *পরশুরামী ব্যঙ্গ ও পুরাণাশ্রিত গল্প 'জাবালি'* ৪৫) –(১) পুরাণ সম্পর্কে আমাদের মনের ধর্মার্জিত পুণ্য ধারণা, সম্ভ্রম, ঐতিহ্যবোধ, দেবদেবী-মুনিঋষিদের সম্পর্কে অন্ধ ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবটিকে যুক্তি প্রয়োগে ধ্বসিয়ে দেওয়া। (২) পুরাণের পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রচলিত বহুবার শোনা কাহিনিকে বর্তমান কালের বিশেষ কোন

ঘটনার সাদৃশ্যে নতুনভাবে নির্মাণ করা। (৩) কোন পৌরাণিক চরিত্রকে নতুন কালের চিন্তা বা উদ্দেশ্যের বাহন করে তোলা। (৪) প্রচলিত ঘটনার মধ্যে ঈষৎ কোন নতুন কাল্পনিক ঘটনার সংযোজন। (৫) পৌরাণিক চরিত্রের মুখে স্থূল ভাষা ও সংলাপ আরোপ। (৬) অসংগত প্রত্যাশিত পরিণতি দেখিয়ে আপন উদ্দেশ্যসাধন। (৭) ঋষিদের বা দেবতাদের সমাজে আধুনিক সমস্যা প্রবর্তনের দ্বারা কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। (৮) বর্তমানের দৃঢ় নিয়মবদ্ধতার উপর পৌরাণিক অতীতের অলৌকিক শক্তির ক্ষণস্থায়ী অধিকার-বিস্তার ইত্যাদি।

সৃষ্টির আদি থেকেই জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। আর সেই অতীত কাহিনিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে নানা লোকবিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর ছোটগল্পকার রাজশেখর বসু তাঁর অন্যান্য সৃষ্ট ছোটগল্পে সেই অতীত দিনের সংস্কার, বিশ্বাসকে 'মিথ' রূপে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পুরাণ বা অতিলৌকিক ঘটনাগুলি লোককথার আড়ালে যেন বর্তমানের কথা বলে।

'মিথ' ও 'পুরাণ' দুটি শব্দকে আমরা অনেক সময় সমার্থক মনে করি। কিন্তু আমরা যাকে পুরাণ বলি, তার উপকরণগত ব্যাপ্তি মিথের চেয়ে অনেক বেশি। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যে বইগুলি পুরাণ বলে গণ্য করা হয় তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতীতি, ইউরোপীয় অর্থের মিথ, কিংবদন্তি এবং বাস্তব ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ একত্রিত হয়ে থাকে। মিথের আদি রূপটির মধ্যে ধর্মাচার, দেবতা কল্পনা এবং বিচিত্র ধরনের সংস্কার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে, আর উত্তরকালের কবি শিল্পীরা সেই উপকরণগুলিকে চয়ন-বর্জন করে নিজেদের সমসাময়িক জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যে সংযোগ করেন। মিথ তার বাইরের আবরণটা পাল্টাতে পাল্টাতে চলে এলেও পুরাণের বহিরঙ্গটি কিন্তু মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

'ছোটগল্প' আধুনিক যুগের ফসল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে এর সার্থক রূপায়ণ। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যে আমরা পাই অল্প পরিসরে ঘটনার বর্ণনা, কোনো তত্ত্ব বা উপদেশ নয়। অন্তরের অতৃপ্তি পাঠকের মনে গল্পের শেষটুকু স্মৃতি বহন করে। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে রাজশেখর বসু পৌরাণিক 'পরশুরাম' নামের আড়ালে ছোটগল্পের আঙ্গিক নিয়ে প্রচলিত লোকপুরাণের মৌখিক গল্পগুলিকে নতুনভাবে রূপদানের উদ্দেশ্যে 'ভাঙা-গড়ার' খেলায় মেতে ওঠেন। আর এই 'ভাঙা-গড়ার' খেলায় পরশুরাম যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গল্পের বুনন তৈরি করেছেন। তুলে ধরেছেন সমাজের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতিকে। সেখানে মুখ্যত পুরাণ কেন্দ্রিক চরিত্রগুলি সরাসরি নামে উপস্থিত হলেও, তিনি প্রচলিত মিথের কাহিনিকে যৎকিঞ্চিত এদিক-ওদিক করে দিয়েই তার ভেতর থেকে এমন কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেছেন যা বস্তুতই হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। কিছু কিছু গল্পে প্রত্যক্ষ মিথের ছায়াপথ ঘটেনি; কিন্তু কাহিনির মূল প্রবণতার মধ্যে কোনো কোনো চরিত্রেরা ঘটনার সঙ্গে একাকার হয়ে মিথসুলভ অলৌকিক কাহিনি সৃষ্টি করেছে। 'জাবালি', 'যযাতির জরা', 'তিনবিধাতা', 'পঞ্চপিয়া পাঞ্চালী', 'উলট-পুরাণ', 'দশকরণের বাণপ্রস্থ' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ কেন্দ্রিক ঘটনাকে রাজশেখর বসু অনেকটা ফ্ল্যাশব্যাকের ন্যায় দেখিয়েছেন। এই গল্পগুলি আধুনিক সময়ে De-construction-এ রূপান্তরিত হয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে, যা প্রচলিত মিথকে ভেঙে নতুন মিথ তৈরি করেছে (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *পরশুরাম গল্পকার* ৫৭)।
তাঁর লেখা পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'জাবালি', 'নির্মোক নৃত্য'', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'রেবতীর পতিলাভ' 'ভরতের ঝুমঝুমি' প্রভৃতি বিখ্যাত।

জাবালি

পরশুরামের শ্রেষ্ঠ গল্প 'জাবালি'। একাধিক সমালোচক এই গল্পের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন– 'জাবালি পরশুরামের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ... বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের এমন সাযুজ্য বাংলা গল্প সাহিত্যে আর নেই। লোকায়তনিক দর্শনের নির্ভয় ধ্বজধারী শালপ্রাংশু পুরুষ জাবালি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরশুরাম একটি সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ বুদ্ধির অসামান্য দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, ২৭)।'

অন্যদিকে পরশুরাম গ্রন্থাবলির ভূমিকায় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন– 'স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারের ছিন্নবন্ধন জাবালি মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটা মূর্তিমান প্রচ্ছন্ন তিরস্কার (প্রমথনাথ বিশী, *কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা*, ১৬)।'

আসলে গল্পে পরশুরাম পুরাণের জাবালি চরিত্রকে নিয়ে এলেও তার মধ্যে আধুনিক মানব সত্যের মর্মবাণী শুনিয়েছেন। পুরাণে জাবালি শুধু তর্কবিতর্ক করেই কাহিনি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরামের লেখায় জাবালিকে প্রতিষ্ঠা করলেন যুক্তিবাদী তত্ত্বে– যা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাল্মীকি রচিত রামায়ণের যে অনুবাদ রাজশেখর বসু করেছিলেন সেখানে জাবালি নিজে রামকে বলেছিলেন–'আমি নাস্তিকের বাক্য বলছি না, আমি নাস্তিক নই; পরলোকাদি কিছু নেই এমনও নয়। আমি সময় বুঝে আস্তিক বা নাস্তিক হই (রাজশেখর বসু, *পরশুরামের গল্পসমগ্র*, ৪৫)।'

এখান থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, জাবালি আসলে বোঝেন মানুষের ধর্ম। যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে, বাঁচার রাস্তাকে মানসিক ভাবে সুগম করে দেয়। তাই সত্য পথে চলা জাবালিকে কোনো লোভ বা মোহ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। আবার এই গল্পেই লেখক দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরাণিক মহিমাকে ক্ষুণ্ন করেছেন। এখানে ইন্দ্রকে দেখানো হয়েছে নিছক কুচক্রী, ভীরু ও সন্দেহবাতিক দেবতা হিসাবে। লোকসমাজে প্রচলিত আছে দেবতারা অন্তর্যামী রাজশেখর বসুর অভিমত– যা মুখ্যত মিথ। এ বিষয়ে রাজশেখর বসুর অভিমত –'কিন্তু বস্তুত তাহাদিগকেও সাধারণ মানুষের ন্যায় গুজবের ওপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে (রাজশেখর বসু, *পরশুরামের গল্পসমগ্র*, ৪৭)।'

অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে নয়, আধুনিক মন দিয়ে যুক্তির দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন পরশুরাম। পুরানো মিথকে ভেঙে নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছেন। তাইতো জাবালি সত্যের আসনে দাঁড়িয়ে তর্জনি নেড়ে বলতে পারেন –'হে চতুরানন, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর ভেংচাইবেন না (রাজশেখর বসু, *পরশুরামের গল্পসমগ্র*, ৫৮)।'

যযাতির জরা

'যযাতির জরা' গল্পে ব্যঙ্গের বিষয় হলো– নারী সৌন্দর্যের প্রতি চিরন্তন মোহ। পঁচিশ বছর যৌবন ভোগের পর যযাতির যৌবনে অরুচির কাহিনি মহাভারতে নেই। কিন্তু পরশুরাম দেখিয়েছেন সুন্দরী যুবতি মনোহরাকে দেখে যৌবনে অরুচিগ্রস্থ বৃদ্ধ যযাতি, তাঁর মহাস্থবির পুত্র পুরু, বৃদ্ধ ঋষি বিভীতক ও হরীতক এবং একপাল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সকলেই লালসার কারণে যৌবন আকাঙ্ক্ষা করেছেন। মহাভারত খ্যাত পুরু স্থবিরত্ব দশা কাটিয়ে যৌবন গ্রহণ করে বিবাহে রাজি হয়েছেন। আসলে পরশুরাম মহাভারতের পৌরাণিক বৃত্তান্তে ভোগ ও ত্যাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে সুকৌশলে বিদ্রূপ করেছেন। শেষের দিকে দারুণ মজার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পুরু তাঁর যৌবন ফিরিয়ে নিয়ে রাণী মনোহরাকে বিবাহ করেন এবং যযাতি তাঁর জরা ফিরে পান। পুরাণ কথাকে উপলক্ষ করে যে সব আধ্যাত্মিক, তত্ত্বকথা বহুসময়ে প্রচারিত হয়ে থাকে, স্বাভাবিক জৈব প্রবণতার বাস্তব ধাক্কায় সেগুলি এক মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে, সেই একান্ত সত্য কথাই পরশুরাম প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে।

পুরাণ সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ বলেছেন "পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী" (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, *২য় খণ্ড* ২৩৪) অর্থাৎ যুগে যুগে নতুন নতুন পুরাণের জন্ম হয়েছে। আর সেই সঙ্গে জন্ম হয়েছে মিথেরও। মিথ বিভিন্নভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করে থাকে। কখনো বা বাস্তব ঘটনা আকারে, আবার কখনো বা পুরাণ ও মহাকাব্য জাতীয় গাথা থেকে। এমনকি বর্তমান সময়ের কোনো জীবিত মানুষও মিথে পরিণত

হতে পারে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের প্রযুক্তি থাকলেও সাহিত্যিকদের মন অতীতের সন্ধানে ব্যাকুল। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যার রসদ তাঁরা খুঁজে পান একটি জাতির ঐতিহ্যের মধ্যে, যেখানে থাকে দীর্ঘদিনের প্রচলিত মিথ। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর মতে collective unconscious মন থেকে সৃষ্টি হয় personal conscious যা নতুন নতুন মিথের গল্প তৈরি করে। পরশুরামের লেখাতেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে। তিনি নিতান্তই সহজ সরলভাবে প্রাচীনকালে দেবদেবী কিংবা লোকসংস্কার যে কতখানি অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল, তা আধুনিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন হাস্যরসের আড়ালে এবং একালের দর্শনের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন গল্প তৈরি করেছেন যা লেখকের personal conscious-এর নামান্তর বটে। আর এভাবেই পরশুরাম সামাজিক নানা বিষয়ের প্রতি তীব্র কুঠারাঘাত করেছেন এবং মানুষের সুবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধিকেও লেখার মাধ্যমে বিদ্ধ করেছেন। এজন্যই রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামের আড়ালে মিথিক্যাল পরশুরামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আধুনিকভাবে ব্যবহার করেছেন।

৪.

উপরি-উক্ত গল্পসমূহের কাহিনি থেকে আমরা বলতে পারি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু পুরাণের সূত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। তাঁর হাস্যরস প্রধান গল্পসমূহে লিপিবদ্ধ। বিখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরামের হাস্যরসের কতগুলি প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসিকদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়– প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন হাস্যরসিকেরা ঈশ্বরগুপ্ত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল– বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করতে চান নি; তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, প্রধানত নব্য ফ্যাশন অথবা প্রাচীন কুসংস্কারকে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই, হাসির সৃষ্টি করেছেন। পরশুরামের মত আধুনিক হাস্যরসিকেরা শুধু সমসাময়িক কালে যে সব অসামঞ্জস্য দেখতে পেয়েছেন তাকে উদ্ঘাটিত করেই খুশী। এর অন্তরালে সংস্কারকের মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয় নি। সমালোচকের এই যুক্তি অংশত সত্য। পরশুরামের হাসি অন্যান্য হাস্যরসিকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপেক্ষা অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এটাও মানতে হবে, কোন সাহিত্যই একবারে উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, আবার প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে সর্বভৌম লাভ করে। পরশুরামের হাস্যরসের অন্যতম আকর্ষণ এই যে এর মধ্যে উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে পড়ে নি; কোন কোন ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য একে লঘু করে দিয়েছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, পরশুরাম অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পে প্রাচীন বিশ্বাস এবং আধুনিক যুগের নাস্তিকতা, যান্ত্রিকতাকে পাশাপাশি রেখে এক অপূর্ব রসজগৎ রচনা করেছেন। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছি অথচ প্রাচীন বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে পারি নি। এই দুইয়ের আনাগোনা ও বৈপরীত্য নানারূপ হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এবং পরশুরাম সেই জাতীয় বহু পরিস্থিতির উদ্ভাবন করেছেন। যে ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা প্রাচীনকালে দেবতা দৈত্য মানুষের বহু সংকট সৃষ্টি করতেন, তাঁর সংকট মোচন করেছে বিংশ শতাব্দীর এক অর্বাচীন বালক তার খেলার ইঁদুর খুঁজতে গিয়ে। অপর দিকে-এই সব দৃষ্টান্ত সমালোচক উল্লেখ করেন নি– আমরা দিব্যমানবদের সাহচর্যে ইন্দ্রসভায় গিয়ে উর্বশীর পরাজয় এবং মর্ত্যে অবতরণ দেখতে পাই। সিদ্ধিনাথ তো প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্ট তিলোত্তমা এবং আধুনিক জগতের চিত্রতারকা তিলোত্তমাকে পাশাপাশি উপস্থাপিত করে এদের অভিন্নতা ও সারহীনতা প্রমাণ করে দিয়েছেন (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *কোরক: রাজশেখর বসু সংখ্যা*, ২৪)।

পরশুরাম যেখানে প্রাচীন জগৎকে পরিত্যাগ করে আধুনিক জগতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছেন সেখানেও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করেছেন। আধুনিক জীবনে দূর নিকট হয়েছে, জীবনের গতি অনেক দ্রুত হয়ে গিয়েছে এবং নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতা এসেছে। কিন্তু এই ব্যাপ্তি ও জটিলতা নানা উপহাসাস্পদ পরিস্থিতির সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের অতি পরিচিত আধুনিক ব্যবসায়ের জটিলতার মধ্যে হামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসকে

প্রবিষ্ট করে এবং গণ্ডেরিরাম প্রাচীন আচারে ও পাপপুণ্যের ব্যাপারে সূক্ষ্ম হিসাব ঢুকিয়ে দিয়ে অভিনব হাস্যরসের মালমসলা আমদানি করেছেন। শিক্ষিত ও শিক্ষিতা তরুণ-তরুণীরা– অনেক সময় তাদের অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে- পাত্রপাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তারও কৌতুকরস নানা গল্পে পরিবেশিত হয়েছে। আবার এটাও দেখা যায় যে যেখানে বিবাহের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সেখানে ট্রাম থেকে পতন, অপরিচিত সহযাত্রীদের অযাচিত উপদেশ, আড্ডাধারী বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যের ফলে চিকিৎসাবিভ্রাটে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এর মধ্যে অতনু দেবতা পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করে এমন এক সমাধান দিয়েছেন যার ফলে আড্ডাটাই ভেঙে গেল এবং মোটর কেনা হল বটে কিন্তু নতুন বিপুলা আরোহিণীর অভ্যাগমে যারা এই মোটর কেনার জন্য বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন তাদের আর জায়গা হল না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরামের গল্পগুলির যে বিশ্লেষণ দেয়েছেন তা থেকে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রথমত– 'এই হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যরসজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য।' রসিকতা করার পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য নিয়ে পাত্র-পাত্রীরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় নি। পরিস্থিতির প্রভাবই তার মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *কোরক: রাজশেখর বসু সংখ্যা* ২৪)।

অবশ্য সমালোচক লক্ষ্য করেছেন যে, পরশুরামের হাস্যরসের একটা লক্ষণ পরিমিতিবোধ ও সংযম-জ্ঞান। একটু অগ্রসর হইয়া বলা যেতে পারে, এই ক্লাসিক পরিমিতিবোধ তাঁর স্টাইলেও প্রতিফলিত হয়েছে; বিশেষ করে এজন্যই তাঁর চরিত্রদের অনেক উক্তি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে তাঁর হাস্যরসের সঙ্গে করুণ রসের উপস্থিতি নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে হিউমারের সঙ্গে করুণের সংমিশ্রণ থাকায় তা অনন্যসাধারণ মাধুর্য লাভ করেছে দেখতে পাওয়া যায়।

৫.

রাজশেখর বসু তথা পরশুরামের পুরাণ ব্যবহারের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমকালীন প্রসঙ্গকে একীভূত করা। পরশুরামের অনুবাদ ও গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সংহতি। প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও বলেননি। রচনাভঙ্গিতে পুরাণকে কেন্দ্র করেও কৌতুকের আমেজে বুনোট বেশ সংহত। ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাস অনেক সময়ই স্বাভাবিক যুক্তি মেনে চলেনি; কিন্তু প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা আঁটোসাটো ফ্রেমে মোড়া। এই ফ্রেমটাই পরশুরামের গল্প। লেখক পরশুরাম ও মানুষ রাজশেখর বসু, কারও মধ্যে মুহূর্তের জন্যও প্রগল্‌ভতা ছিল না, চাপল্য ছিল না। ব্যক্তিজীবনের প্রবল ব্যক্তিত্ব-গাম্ভীর্য পরশুরামের লেখার মধ্যেও সমানভাবে আছে। তাই তিনি নিজে না হেসে পাঠকদের হাসাতে পেরেছেন। মানুষের সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনকে নিয়ে মজা করতে পেরেছেন। এমনকি নিজেকে নিয়ে মজা করতেও কুণ্ঠিত হননি। রাসায়নিককে নিয়ে ব্যঙ্গ করা আসলে তো নিজেকেই ব্যঙ্গ করা। নিজের পেশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ করার মতো ক্ষমতা একজন সৎ ও সাহসী মানুষের পক্ষেই সম্ভব। রাসায়নিকের বুদ্ধির উদ্ভট প্রয়োগের মাধ্যমে গল্পে হাস্য-ঘন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে অনুবাদে তিনি শেষ পর্যন্ত পুরাণনিষ্ঠ থেকেছেন।

তথ্যসূত্র

সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ২০০২।

বসু, রাজশেখর। *বাল্মীকি রামায়ণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯।

বসু, রাজশেখর। *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত*, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯।

ঘোষ, কল্যাণী। *রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য*, ফার্মা, কে এল এম, ১৯৮৩।

গোস্বামী, দীপক। *পরশুরামী ব্যঙ্গ ও পুরাণাশ্রিত গল্প 'জাবালি'*, কোরক, বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৮।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। *পরশুরাম গল্পকার*, অবভাষ, ২০১১।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, শরতের মেঘে বজ্র' (পরশুরাম) প্রকাশ ভবন, ১৩৭৮।

বিশী, প্রমথনাথ। *কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা*, শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

বসু, রাজশেখর। *পরশুরামের গল্পসমগ্র*, অবসর প্রকাশনী, ২০২৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *কোরক: রাজশেখর বসু সংখ্যা*, বইমেলা, ১৯৯৫।